টেবিলে বসার আগেই সদানন্দর মুখটা কালো হয়ে গেল, তোমরা আজকালকার মেয়ে, এ সব মানো? মেয়ে এ সব ফালতু নিয়মকাকুন পালন করতে দেয় কী করে?

– যখনই আসে গার্জেনগিরি করে। আমার জন্যে তোমারও কষ্ট হচ্ছে নাকি!

– সেটা না বোঝার মতো মেয়ে কি তুমি? হ্যাঁ, তোমার ঠাকুরচাকর কাউকে খাবার ঘরে দেখছি নাতো! রান্নাবান্না করেই সব ছুটি? সব তো দেখছি এদিকওদিক খোসমেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখন তুমি একা!

– ওদের বারণ করলাম। আমি নিজেই খাবার সাজিয়েছি। বললাম না, আমার কিছু সমস্যা আছে। একটু আগে গ্যারেজ ঘরে ঢুকেছিলাম, লক্ষ করনি?

– না তো। গ্যারাজে, কেন? আমার যাওয়ার ব্যবস্থা?

– বললাম তো সমস্যা। একটু খাতির করে খাওয়াব বলে সমস্যা।

– খাওয়ানোর মধ্যে সমস্যা?

– হ্যাঁ। তেমন নিজের মানুষকে খাওয়ানোর সমস্যা। দেখ তো, টের পাও কিনা! তুমি বুদ্ধিমান মানুষ।

– তোমার সমস্যা আমি টের পাব কী করে! হ্যাঁ, অনেক পদ – বিস্তর আয়োজন।

– টেবিলের উপর খাবার বাসনগুলো দেখে কিছু আন্দাজ করতে পারছ না?

– মানে? হ্যাঁ, খুব সুন্দর গেলাসটা। একটু সাদাটে ... কেমন যেন! একটু বেশি চকচক করছে। রুপোর, না?

– যাক, চিনতে পেরেছ। গেলাসবাটিগুলো সব রুপোর। এগুলো রোজ ব্যবহার করি না। সমস্যা হল থালাগুলো নিয়ে। তুমি আসার পর একটু মনের মতো আপ্যায়ন করব বলে আজ নিজের হাতে গ্যারেজ থেকে বের করেছি।

– গ্যারাজ থেকে থালা? মাথায় ঢুকল না।

– বললাম না, কিছুদিন আগে যখন শান্তিনিকেতনে গিয়ে একটা রাত্রি আসতে পারলাম না। বিরাট ডাকাতি হয়ে গেল। পেপারে বেরিয়েছিল, দেখনি?

– মনে পড়ছে না। বিশলাখির নামই শুনিনি। তোমার বাড়িতে ডাকাতি!

– সেদিন সবই নিয়ে যেত। পারেনি। যা ব্যবস্থা করে রেখেছি, কারও ধারণাতেই আসবে না। ওই থালায় যে খাচ্ছ, ওটা কিসের? এখনও ধরতে পারনি মনে হচ্ছে।

– কেন, কাঁসার। নাঃ, একটু বেশি ঝকঝকে মনে হচ্ছে।

– হ্যাঁ।

– সত্যি? যা ভাবছি, তাই কি!

– সত্যিই সোনার। এ রকম আরও চারখানা আছে। ডাকাতরা খুঁজে পেলে কী হত বল তো? ওই যে বললাম, গ্যারেজ থেকে বের করলাম। কাউকে বলে ফেলো না আবার!

– গ্যারাজে সোনার থালা? এ তো ডিটেকটিভ গল্প। মাটি খুঁড়লেই পাওয়া যায় বুঝি। এ তো ইউ.পি–র সেই উন্নাওয়ের মতো ব্যাপার ... সরকার টের পেলে?

– সব ডিক্লারেশান দেওয়া আছে। তোমাকে বলি আজ। বিশাল সম্পদ ইনহেরিট করেছি। কাউকে তো জানাতে পারি না, খুব কষ্ট হয়। শুধু মেয়ে আর আমি আলোচনা করি, এতসব কী হবে? ও–ও তো বাচ্চা মেয়ে, কী করা যায়!

সদানন্দ খেতে খেতে মুখ তুলল, বুঝলাম। এই তা হলে তোমার সমস্যা?

– বলতে পার। থেকে যাও না আজ। প্লিজ! সবটা শুনে একটু বুদ্ধিটুদ্ধি দিয়ে যাও তো! অঙ্কে অমন তুখোড় ছিলে, বৈষয়িক বুদ্ধি কি আর নেই?

– এক্কেবারে না। দু'দিকে মাথা দোলাল সদানন্দ, নিজের জমে যাওয়া সামান্য টাকাপয়সাগুলো নিয়েই যে কী করব, তাই ভেবে পাই না। আর তোমার যা আঁচ করছি, কোটি কোটি টাকার ব্যাপার।

– আজ থাকবে? রবিবার তো! অনেক কথা আছে। কাল সকালবেলা বেরোলেই স্কুলের আগে পৌঁছে যাবে। ভোরবেলা ট্রেন আছে। মালদা ফাস্ট প্যাসেঞ্জার। থেকে যাও না। বেশি দাম বাড়িও না।

ইচ্ছেটা দমন করে সদানন্দ বলল, নাঃ, আজ থাক। খোঁজ যখন পেলাম তোমার, আর কি ছেড়ে থাকতে পারব? মাঝেমাঝে তো আসতে হবেই।

– আমার জীবনে অনেক সমস্যা। নানা বিচিত্র গল্প সব জমা হয়ে আছে। এই রাজবাড়ির জটিল ইতিহাস। কেউ জানে না। আমি মরে গেলে সব চাপা পড়ে যাবে। মেয়েকেও তো সে সব বলতে পারব না। বলা যাবে না।

আজ থাকবে? রবিবার তো! অনেক কথা আছে। কাল সকালবেলা বেরোলেই স্কুলের আগে পৌঁছে যাবে। ভোরবেলা ট্রেন আছে। মালদা ফাস্ট প্যাসেঞ্জার। থেকে যাও না। বেশি দাম বাড়িও না। ইচ্ছেটা দমন করে সদানন্দ বলল, নাঃ, আজ থাক। খোঁজ যখন পেলাম তোমার, আর কি ছেড়ে থাকতে পারব

– নিজের মেয়েকেও বলা যাবে না, সে আবার কেমন ইতিহাস?

– যদি বলি, তখন বুঝবে, এই বিশলাখির রাজবাড়ির প্রতিটা কাঠপাথরে কত অবিশ্বাস্য কাহিনি লুকিয়ে আছে, ধারণা করতে পারবে না।

– তুমি জানলে কী করে? তোমাকে কে বলল? তুমি তো মাত্র চব্বিশ বছর এসেছ এই বাড়িতে।

– হতে পারে। কিন্তু আমিই এই রাজবাড়ির ইতিহাসে প্রধান চরিত্র। আমাকে নিয়েই গল্প। চিরকালের জন্য চাপা পড়ে যেতে পারত অদ্ভুত এই কাহিনি। এ যে কাউকে বলার নয়। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। জানি, তুমি অন্তত আমার খাতিরে এই রাজবাড়ির অসম্মান হতে দেবে না। তোমার চোখ দেখে বুঝেছি, তুমি আজও আমাকে ভালোবাস। মিথ্যে বললাম?

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে। নানা উপাদেয় ব্যঞ্জনের স্বাদ যেন জিভে টেরই পাওয়া গেল না। সদানন্দ বড় বিচলিত হয়ে পড়েছে। বহু বছর পর আজ যখন সেই মনের মানুষটার সঙ্গে দেখা হল, কী সব বলছে সে? থেকে যাবে রাতটা আজ? সাহসে কিছুতেই কুলোতে পারছে না যে!

আনমনে এঁটো সোনার থালায় আঙুল দিয়ে এলোমেলো নকশা কাটতে কাটতে সদানন্দ বলল, আসব কড়ি, নিশ্চয় আসব। বারেবারে। আজ শুধু বল, এই সোনার থালার কথা। গ্যারেজে সোনার থালা?

(ক্রমশ)

অঙ্কন ঃ সোমনাথ

রসেবশে

পড়াশোনা করে যে

সুনৃতা মাইতি

গা গতর নাড়িয়ে যদি কেউ এই বিষয়টি নিয়ে সমীক্ষা শুরু করে তবে এটা স্থির নিশ্চিত যে অন্তত এই একটি বিষয়ে বঙ্গমাতাগণ 'জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন' পাবেন। আহা, পোলাপানের পঠনপাঠনে নাক গলানোর মতো পরম মহৎ কাজটি তাঁরা নিরবিচ্ছিন্নভাবে করে চলেন যে। আমাদের এলাকার গুগলজেঠু পুলিনবাবুর কাছে অবশ্য এর একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যখ্যাও আছে। সেটা কিছুটা এইরকম – 'ইহারা তৃতীয় বিশ্বের ঈগলচক্ষু মাতা। পোলাপানের মধ্যে নিজ উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে চাহেন'। তাই বুঝি! কি জানি! কিন্তু ছানাপোনা যদি বঙ্গীয় কুকোষ সমন্বিত কুবুদ্ধির আখর হয়, মাতাদের আর কীই বা করণীয় বলুন? এ সার সত্য কাকে বোঝাবেন? সকল বাচ্চাই তো আর ওই পাশের বাড়ির সুবোধ গোপাল কিংবা গোপালীর মতো মহান অথবা মহতী নয়! ইশকুল থেকে ফিরেই সেই সব ভালোমানুষ পোয়েরা চাট্টি মুখে গুঁজেই পড়তে বসে যায় এবং পড়তে পড়তেই তাদের রাত ভোর।

অতএব পাঠনপাঠন হেতু বাকি সব রাখাল জননীদের প্রত্যেকের স্বীয় 'এক এবং অদ্বিতীয়' অঙ্গে বহুবিধ রূপ পরিগ্রহণ ব্যতিরেকে গত্যন্তর কী? বোঝা যাচ্ছে না বুঝি! কয়েকটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটি একেবারে জলবৎ তরলম হয়ে যাবে।

যেমন ট্যাঁপার কথাই ধরুন। অতি চালাক ট্যাঁপার অদূরদর্শী পিতা সাত পাঁচ না ভেবেই ট্যাঁপার হাতে তুলে দিলেন 'হাইজু' অ্যাপ, ভর্তি করলেন 'বাতাস' কোচিং সেন্টারে। না কি ছেলে তার অতি ধুরন্ধর বিদ্যাবাগীশ হবে। অমনি ছেলের হাতে চলে এল আস্ত দুইখানা 'লার্নিং ট্যাব'। মহানুভব ট্যাঁপা তার কুবুদ্ধি প্রয়োগপূর্বক ট্যাবকে দিব্য 'ফরম্যাটিং' করে কালক্রমে নিজ চিত্ত বিনোদন কার্যে নিয়োজিত করল। কিন্তু শেষরক্ষা হল কই? মোক্ষম সময়ে ট্যাঁপার মাতা 'মাতাহারি' রূপে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন এবং পুত্রের এবংবিধ কীর্তির পর্দা ফাঁস করে সপুত্র পিতাকে যারপরনাই পর্যুদস্ত করে 'ফেলিদি'র শেষ হাসি হাসলেন।

আবার গদাই–এর বাড়ির সামনে দিয়ে সন্ধ্যাবেলায় একটু পায়চারি করলেই শুনতে পাবেন গদাই এবং তস্য মাতার উত্তেজিত বার্তালাপ। গদাই বলছে, পাঁচ, মাতা বলছেন, পনেরো। অবশেষে মাতা নিদান দিলেন, 'আচ্ছা, তোমারও থাকবে, আমারও থাকবে, শেষমেশ দশে রফা করো।' আপনি আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন এই ভর সন্ধ্যায় মাতা পুত্রের এইরকম গড়িয়াহাটীয় দরদামের কারণ কি? কিছুক্ষণ আরও কান পাতুন। বুঝতে পারবেন মাতা পুত্র অঙ্ক নিয়ে কথা কইছেন। গদাইয়ের অঙ্কাভ্যাস চলছে কিনা! অতএব অঙ্কের সংখ্যা নিয়ে উভয়ের দরদাম এবং বাদানুবাদ চলছে। মাতা কালে কালে এক সুদক্ষ বেচুবাবু হয়ে উঠেছেন।

পটারামের মাতার ব্যাপার অবশ্য অন্য। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় অতীব করিৎকর্মা। পটারামের 'ইন ভোগ' মাতা সোশ্যাল মিডিয়ায় ইনিয়ে বিনিয়ে এবং প্যানপেনিয়ে সমাজশিক্ষামূলক গল্প লেখেন। 'অসাধারণ', 'অনবদ্য', 'অতুলনীয়' ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত হয়ে ইদানীং তিনি খটখটে দিনের আলোয় নিত্য 'ঝিলমিলাতা সিতারোঁ' দেখছেন। তা তার ঘরেও কি কম অশান্তি! একদিন স্বভাববশতঃ পুত্রের পড়ার ঘরে আড়ি পেতে মাতা শুনতে পেলেন তাঁর রত্নপ্রতিম পুত্র এবং অঙ্কশিক্ষক মহাশয় কথোপকথনে প্রবৃত্ত। শিক্ষক মহাশয় বললেন ...

'বাছা, কীভাবে এর উত্তর মিলে গেল? মধ্যিখানে এটি কি? ভারী রহস্যময় তো!'

পটারাম অম্লানবদনে জবাব দিলেন –

'ইয়ে এক্স, মানে একটি ভ্যারিয়েবল ... আর কি!'

শিক্ষক মহাশয় চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা হঠাৎ এ স্থানে এটির আগমনের হেতু?'

পটারাম নির্বিকার মুখে পা দোলাতে দোলাতে জানাল, 'ইয়ে, যে কোনও প্রবলেম সলভ করতে হলে 'থার্ড পার্টিকে' হস্তক্ষেপ করতেই হয় কিনা বলুন? তা উত্তর মিলছিল না। কী আর করি! শেষে একটা উপরি এক্স আনতেই পুরো কেস জমে ক্ষীর! প্রবলেম সলভ্ড।'

এদিকে দরজার আড়ালে পটারামের আপাদমস্তক জ্বলনরত মাতা বেশ বুঝতে পারছিলেন তার একলৌতা ছেলে দিব্যি লায়েক হয়ে উঠেছে। তিনি 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' গল্প লেখেন, আর তাঁর পুত্র 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' অঙ্ক করেন। অতএব সেইদিন থেকে তিনি সামাজিক গল্পলিখন স্থগিত রেখে সপুত্র অঙ্কচর্চায় নিয়োজিত হলেন। কী আত্মত্যাগ বুঝুন! মাঝখান থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় একজন উদীয়মান সমাজ সংস্কারককে অকালে হারাল।

বুঁচকির আবার বাংলা নিয়ে সমস্যা। বানান প্রয়োগে তিনি মূর্তিমতী কালিদাসী। পরীক্ষায় কোনও একখানি প্রশ্নের উত্তর লিখতে গিয়ে তিনি 'আবিষ্কার' বানানের তিনরকম প্রয়োগ করেছেন। শঙ্কিত মাতা এ প্রসঙ্গে সদুত্তর চাইলে তিনি নিশ্চিন্ত মুখে জানিয়েছেন, 'আহা, ম্যামের যে বানানটি দরকার সেটা ঠিক বুঝেশুনে নিয়ে নেবেন। এতে এত চিন্তার কি আছে?' এতেই কি শেষ? এরই মধ্যে আরও একটি পরীক্ষায় তার লেখা একটি ব্যক্তিগত পত্রের শেষ লাইন ইশকুলে এক বহুচর্চিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। লাইনটি হল, বড়দের আমার 'আসিব্বাদ' এবং ছোটদের 'সোদ্দা' জানালাম। এইসব দেখেশুনে বুঁচকির মা প্রথমটায় হাসবেন না কাঁদবেন বুঝতে পারছিলেন না। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি হাল না ছেড়ে বরং কণ্ঠ ছেড়েছেন জোরে। অতএব আশা করা যায় অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বুঁচকি ও তার মাতা বাংলা ব্যাকরণ বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠবেন।

বুঁচকির বেস্টোফ্রেন্ডো শুঁটকির আবার সমস্যা অন্যরকম। তিনি এই ইহজীবনের বড্ড বেশি বুঝে ফেলেছেন। ফলতঃ প্রায়শই স্কুল থেকে বিবিধ অভিযোগ আসতে থাকে। উপরন্তু তিনি আবার বাংলায় বিশেষ দর। কিছুদিন আগেই তিনি বাংলা ক্লাসে দুটি অসাধারণ বাক্যরচনা করেছেন। সন্ধান এবং নির্মাণ এই দু'টি শব্দ দিয়ে তিনি যথাক্রমে লিখেছেন, 'আমার মা বাবার লুকোনো টাকার সন্ধান খুব তাড়াতাড়ি করতে পারে।' এবং 'পিতা মাতা নিজেদের শরীর দিয়ে সন্তান নির্মাণ করেন।' এইরকম অবস্থায় শুঁটকির মাতা পঠন পাঠনের পাশাপাশি নীতি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা মর্মে মর্মে অনুধাবন করেছেন এবং স্বীয় জীবনকে একটি পবিত্র নীতিকথায় পরিণত করেছেন। ইদানীং তাঁর বাড়ির টিভিতে শাস–বহু সিরিয়ালের পরিবর্তে অহোরাত্র 'খাস্তা' চ্যানেল চলে এবং বাড়ির সামনে দিয়ে গেলেই যেন মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি বেজে ওঠে।

মাতাগণের এই অনলস প্রচেষ্টা এবং সমূহ আত্মত্যাগকে ভুলেও পরিহাস করবেন না যেন। কে বলতে পারে, একদিন এই গণ্ডা গণ্ডা রাখাল রাখালীর গোপালত্বে উত্তরণ ঘটবে না! সেইদিনের অপেক্ষায় মাতারা লড়ে যাবেন। ঊর্ধ্বনেত্র বুদ্ধিজীবীদের মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা চলুক গে। এইরকম আলোচনা তো কতই ঘটে। তাতে কীই বা আসে যায়। মাতারা মাত্র দুটি বাক্য ভালোভাবে বোঝেন। 'পড়াশোনা করে যে গাড়িঘোড়া চড়ে সে' এবং 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'।

অঙ্কন ঃ অভি